গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড,ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২৯৫৬০৮৪৩
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

‘‘আদালতে মামলা জট : কারণ ও সমাধানের সন্ধানে’’
শীর্ষক কর্মশালা

২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ শনিবার
০৬ জুন, ২০১৫

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০

আদালতে মামলা জট ঃ কারণ ও সমাধানের সন্ধানে

জেলা আদালতসমূহের ২০১৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২৬ লক্ষাধিক। এ অবস্থা একদিনে বা এক বছরে হয়নি। বহু বছরের পুঞ্জীভূত সমস্যা বর্ধিত হয়ে বর্তমানে এই অসহনীয় পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে।

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টির সময় তদানিন্তন পূর্ববঙ্গ হতে বহু সংখ্যক বিচারক ভারতে অপশন দিয়ে চলে যান। ফলে অন্যান্য সার্ভিসের বিচার বিভাগেও বিচারক শূন্যতা দেখা দেয়। সংকট এমন পর্যায়ে ছিল যে, অনেক জেলায় একজন মুন্সেফ জেলা জজের স্থানে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য হন। জরুরী ভিত্তিতে বিচারক নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করে তখনকার সমস্যা অনেকটাই দূরীভূত করা সম্ভব হয়েছিল ।

ঐ সময় ঢাকা কেবল একটি জেলা শহর ছিল এবং রাতারাতি প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিণত হলে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নানান জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন, শহর সম্প্রসারণের জন্য সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ, জমির মূল্য বৃদ্ধি, ভারত ও অন্যান্য জেলা হতে অসংখ্য লোকের ঢাকায় আগমনের ফলে বাসস্থানের চরম অভাব, অগ্রক্রয় বৃদ্ধি, সামান্য জমি যার জন্য আগে আদৌ কোন চিন্তা না থাকলেও জমির মূল্য বাড়ার কারণে প্রচুর ফৌজদারি ও দেওয়ানি মোকদ্দমা উদ্ভব হতে থাকে। তাছাড়াও নতুন স্বাধীন দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরের উপর অত্যাচার নির্যাতনের কারণেও ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে প্রচুর সংখ্যায় শরণার্থী ভারত থেকে আগমন করার ফলেও নূতন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়, যার বাড়তি চাপ পুলিশ প্রশাসন ও অনেক ক্ষেত্রে বিচার বিভাগকে সামাল দিতে হয়। পরিণতিতে আবশ্যিকভাবে বাড়তি মামলার চাপ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

ইতোমধ্যে ১৯৫০ সালের East Begal State Acquisition and Tenancy Act এর আওতায় জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়। সে কারণে উচ্চ আদালত ও জেলা আদালতসমূহে বহু নুতন মামলা দায়ের হতে থাকে। এর মধ্যে ১৯৫৬ সনে নূতন করে এস.এ. খতিয়ান প্রণয়নের কাজ শুরু হলে ভূমির মালিকানা ও দখল সংক্রান্ত অনেক নূতন বিরোধ দেখা দেয় ও মামলা দায়ের হতে থাকে। এ সব অতিরিক্ত মামলার চাপ তদানিন্তন অল্প সংখ্যক বিচারকদেরকেই বহন করতে হয়। এতে অবশ্যম্ভাবীরূপে মামলা জট বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তাছাড়া, গত শতকের পঞ্চম দশকের শেষ দিকে পাঁচশালা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে ক্রমান্বয়ে নানা ধরণের দেওয়ানি মোকদ্দমার চাপ নতুন করে সৃষ্টি হতে থাকে।

ইতোমধ্যে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ আরম্ভ হলে The Enemy Property (Custodian and Registration) Order, 1965 এবং The East Pakistan Enemy Property (Land and Building) Administration and Disposal Order, 1966, এর আওতায় বিভিন্ন সম্পত্তির মালিকানাকে কেন্দ্র করে বহু মোকাদ্দমা দায়ের হতে থাকে।

কিন্তু তদানিন্তন সরকার বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তাছাড়া, সে সময় মুন্সেফ ও সাবজজ পদমর্যাদার বিচারকগণকে পদায়ান করার ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের থাকলেও অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং জেলা ও দায়রা জজ নিয়োগে হাইকোর্টের কোন ভূমিকা ছিল না। এই নিয়োগ সরকার করতো। অনেক সময় ২৫/৩০ বৎসর চাকুরী করার পর অনেক বিচারকই সাবজজ বা মুন্সেফ হিসেবেই অবসর গ্রহণ করতেন। এ কারণে বিচারকগণের মধ্যে হতাশা বিরাজ করতো এবং বিচার বিভাগকে নানান ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়, এমনকি প্রাদেশিক নব্য শাসকদের তুলনায় পিছনে ঠেলে দেওয়া হতে থাকে, যদিও বৃটিশ ভারতে সর্বস্তরের বিচারকগণ অন্যান্য সার্ভিসের তুলনায় সন্তোষজনক বেতন ভাতাদি পেতেন। ফলে কিছুটা হলেও বিচার বিভাগ মেধাশূণ্য হতে থাকে। অন্যদিকে, মামলা মোকাদ্দমা স্তুপীকৃত হতে থাকে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আবার নতুন করে বৈরী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দেড় কোটি শরণার্থী তাদের ঘর-বাড়ী, সহায়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মুক্তিযুদ্ধ শেষে শরণার্থীরা স্বাধীন দেশে প্রত্যাবর্তন করলেও অনেকেই তাদের পরিত্যক্ত সহায়-সম্পত্তি বেদখল দেখতে পান। ফলে নূতন অনেক দেওয়ানি ও ফৌজদারি মোকদ্দমার উদ্ভব হতে

থাকে। ইতোমধ্যে ১৯৭৬ সালে রিভিশনাল সেটেলম্যান্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে সেখানেও নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়, যার শেষ গন্তব্য হয় আদালত। তাছাড়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত নূতন দেশে গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যাদির কারণেও বিভিন্ন প্রকৃতির নূতন মামলা বিচার বিভাগের সামনে আসতে থাকে।

অতি সম্প্রতি আর এক ধরণের মোকদ্দমার আধিক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০০১ সালের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইন ২০১১ সালে সংশোধনীর পর জানা যায় যে প্রায় ৯ (নয়) লক্ষ মোকদ্দমা ইতোমধ্যে দায়ের হয়েছে। ২০১৪ সালের উক্ত ধরণের মোকদ্দমার বিবরণীতে দেখা যায় যে, ১ জানুয়ারি ২০১৪ মোকদ্দমার সংখ্যা ছিল ২,৪৬,১০৭ টি। নূতন দায়ের হয়েছে ৫৪,৫২৫ টি। সর্বমোট ৩,০০,৬৩২ টি। এর মধ্যে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিস্পত্তি হয়েছে ১,৫৫,০৩৬ টি এবং বিচারাধীন রয়েছে ১,৩৩,৭০২ টি মোকদ্দমা।

১৯৪৭ সাল হতে এভাবে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার সংখ্যা বহু গুণ বৃদ্ধি পেলেও বিচারকের সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পায়নি। ফলে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাছাড়া এটা অনস্বীকার্য যে, আগের মত প্রাজ্ঞ ও দক্ষ, উচ্চমান সম্পন্ন বিচারকের সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পেতে থাকে। তার প্রধানতম কারণ, বিচারকদের চাকুরীর সুযোগ সুবিধা তেমন বৃদ্ধি না হওয়ায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা এ পেশা গ্রহণে আকৃষ্ট হচ্ছে না। যার ফলে বিচার বিভাগ ক্রমান্বয়ে মেধাশূন্য হতে থাকে।

তাছাড়া, ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও সামরিক শাসন এবং পুনরায় ১৯৮২ সালের সামরিক শাসন এর কারণে স্বাভাবিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে চরম অবক্ষয় হয়, তার ধাক্কা অন্যান্য বিভাগের সাথে বিচার বিভাগেও লাগে। যার ফলে নানান রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। ১৯৮৩ সালে উপজেলা সদরে মুন্সেফ কোর্ট ও ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন করা হয়। তদানিন্তন সরকার বিচার বিভাগকে জনগণের দোরগোড়ায় নেবার একটি ভ্রান্ত ধারণা থেকে উপজেলায় বিচার বিভাগকে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এতে বিচার বিভাগ ক্ষতিগ্রস্তই হয়। তাড়াহুড়া করে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বহু সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ/সহকারী জজকে কার্যত কোন প্রকার প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে উপজেলাসমূহে পদায়ন করা হয়। সেইরূপ নিঃসঙ্গ অবস্থায় সবাই না হলেও অনেক বিচারক স্থানীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে বাধ্য হন এবং এরা স্থানীয় নোংরা রাজনীতির কুটচক্রে পড়ে যেতে থাকেন। অনেক বিচারকের পদস্খলনও ঘটতে থাকে। তাছাড়া, হঠাৎ করে বহু সংখ্যক সম্পূর্ণ নূতন আদালতের কাজ পরিচালনায় নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকে।

আদালতের সেরেস্তাদার বা নাজির, পেশকার, পিওন সামান্য কর্মচারী হলেও তারাও বিচার বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং বিচারকার্য ঠিকভাবে পরিচালনার জন্য তাদেরও ভূমিকা রয়েছে। তাদের সঙ্গে স্থানীয় আইনজীবী, যারা প্রায়শই স্থানীয় বাসিন্দা ও বিচারপ্রার্থী জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগের কারণে নৈতিক স্খলনসহ নানারূপ সমস্যা পুঞ্জীভূত হতে থাকে। তাতে বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটের ভাবমূর্তি মসীলিপ্ত হতে থাকে এবং অন্তিমে ন্যায় বিচার ব্যহত হতে থাকে।

ইতোমধ্যে তদানিন্তন সরকার প্রায় ৬০০ কর্মকর্তাকে নাম মাত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। ফলে সেখানেও ন্যায় বিচার প্রহসনে পর্যবসিত হতে থাকে।

উন্নয়ন কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের অজুহাতে ১৯৮৩ সালে এক প্রশাসনিক আদেশ বলে সরকার প্রত্যেকটি মহাকুমাকে জেলায় উন্নীত করে। পূর্বতন ১৯টি জেলার পরিবর্তে রাতারতি ৬৪ টি জেলা হয়। ফলে দ্বিগুণেরও বেশী জেলাজজ নতুন করে সৃজন করা হয়। এইরূপ অবস্থায় অনেক অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মাত্র কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে জেলা ও দায়রা জজ পদে অধিষ্ঠিত হন। তাদের প্রশাসনিক ও বিচারিক অভিজ্ঞতার ঘাটতি ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে একটি বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের সংবিধান বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ হতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন সত্তা হিসাবে থাকবে বলে ঘোষণা দিলেও কার্যক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সোনার হরিণ হয়েই থাকে। তাছাড়া, এই বিভাগ কোন সময়ই সরকারের নিকট থেকে যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। ফলে প্রতিশ্রুতিশীল তরুনগণ পূর্বের মত বিচার বিভাগে যোগদান করতে আগ্রহী হয়নি।

তাছাড়া, গতশতকের আশির দশকের প্রারম্ভ হতে অনেক নতুন নতুন আইনের আওতায় নানা ধরনের আদালত সৃষ্টি করা হয় এবং সেই সকল নতুন আদালতের দায়িত্ব বিদ্যমান বিচারকগণকেই তাদের পূর্বের বিচারিক কার্যের অতিরিক্ত হিসেবে পালন করতে হয়। ফলে বিচার কার্যের এই বাড়তি চাপ সামাল দেয়া সম্ভব হয় না। যার ফলে একদিকে স্তূপীভূত মামলার পরিমাণ

বাড়তে থাকে, অন্যদিকে একই বিচারককে বিভিন্ন ধরণের মামলা নিষ্পত্তি করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়। অন্তিমে অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায় বিচার ব্যাহত হতে থাকে; বিচার বিভাগের উপর সাধারণ জনগণের আস্থা কমতে থাকে এবং আপীল ও রিভিশনের সংখ্যাও বাড়তে থাকে।

এভাবে ধীরে ধীরে উপর্যুক্ত কারণাধীনে বিভিন্ন ধরনের মামলার সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার প্রভাব হাইকোর্ট বিভাগেও পড়ে ।

১৯৯৯ সালে মাসদার হোসেন বনাম সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মামলার রায়ের পর ২০০৭ সালে জেলা পর্যায়ের আদালত নির্বাহী বিভাগ হতে পৃথক হয় এবং বিচারক ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিয়োগ প্রদানের জন্য একটি জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন স্থাপন করা হয়। বৃটিশ আমলে মুন্সেফ পদে নিয়োগের জন্য অন্তত ৫ (পাঁচ) বছর ওকালতির প্রয়োজন হত। ফলে তারা সাধারণ বিচার প্রার্থীগণের কষ্ট, দুর্ভোগ, আর্থিক সমস্যা ও মর্মজ্বালার সঙ্গে কিছুটা হলেও পরিচিত হত। কিন্তু বর্তমান নিয়োগ পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয় হতে সরাসরি বিচারকের আসনে বসবার ফলে অনেক বিচারকই বিচার প্রার্থীগণের মানবিক সমস্যা প্রায়শই মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হন। তারা শুধু চাকুরীই করেন, কোনদিনই সত্যিকার বিচারক হয়ে ওঠেন না।

বর্তমানে জেলা পর্যায়ের বিচার বিভাগ আইন মন্ত্রণালয় ও সুপ্রীম কোর্টের একটি দ্বৈত শাসনের আওতায় রয়েছে। এ ব্যবস্থা ভালো না মন্দ বা আরও উন্নতির পথ রয়েছে কিনা তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। তবে এতে এক ধরণের checks and balance রয়েছে। বিচার বিভাগের প্রকৃত ও অর্থবহ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, তাতেই বিচার ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ও সুস্থতা ফিরে আসবে, বিচার প্রার্থীগণ ন্যায় বিচার পাবেন। বিচার বিভাগের কর্তৃত্ব কার হাতে তা নিয়ে মোটেও মাথা ব্যথা নেই।

ব্রিটিশ আমলে ও তৎপর পাকিস্তান আমলের, প্রাথমিক পর্যায়েও জেলা পর্যায়ের বিচারকগণ নির্বাহী বিভাগের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে থাকত, কিন্তু পদোন্নতি ও পদায়নের জন্য তারা কোন প্রকার তদবীর করার কথা চিন্তাও করতে পারতেন না। কোন প্রকার তদবীর করবার চেষ্টা করলে তা একটি অসাদচরণ বলে গণ্য করা হতো। বিচারকগণ তাদের বিচার কাজের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ রাখতেন এবং যোগ্যতার ভিত্তিতেই তাদের পদোন্নতি হত। কিন্তু পরবর্তীকালে বিচারকগণ মন্ত্রণালয়ে নানা বিষয়ে তদবীর করা আরম্ভ করেন। এভাবেই বিচার বিভাগে অবক্ষয়ের প্রারম্ভ।

বর্তমানে অবস্থা আরও ভয়াবহ। পূর্বে জেলা পর্যায়ের বিচারকগণের সাথে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের কোনরূপ যোগাযোগ হওয়ার সম্ভবনা ছিল না। এ সম্বন্ধে প্রচারিত একটি নির্দেশিকা (circular) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অনুসরণ করা হত। কিন্তু বর্তমানে শোনা যায় যে, অনেক জেলা পর্যায়ের বিচারকগণ হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিগণের নিকট গিয়ে তদবীর করেন। আবার এমন অভিযোগও আছে যে, অনেক বিচারক বিভিন্ন বিচারাধীন মামলায় কোন কোন বিচারপতির নিকট হতে তদবীর পান। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে সততা, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতা যেন আর পদোন্নতির মাপকাঠি নয়, কার সাথে কার যোগাযোগ আছে, তাই প্রধান।

এই সকল অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তবে উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালত, সার্বিকভাবে বিচার বিভাগের ভাবমূর্তি বর্তমানে মোটেও উজ্জ্বল নয়। মানুষের শেষ ভরসা বিচার বিভাগ এক ভঙ্গুর অবস্থার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এখানেও Rule of Law প্রয়োগের ব্যর্থতা রয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে আমাদের সংবিধান বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রে Government of Laws প্রবর্তন করেছে, Government of men নয়। তা সত্যিকার অর্থে অনুশীলন করা প্রয়োজন।

এই প্রেক্ষাপটে বিচার বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে নূতনভাবে চিন্তা করার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অন্যথায় মামলার জট দূর করা তো দুরে থাক, বিচার বিভাগ এর প্রধান কাজ ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতেই ব্যর্থ হবে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে বিচারকগণ নিজেরাও ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচেছন। বিচার বিভাগ কখনও এক বা এমনকি একাধিক ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে পারে না। কেবল সংবিধান ও আইন বিচার বিভাগকে পরিচালনা করবে। তা হলেই 'বিচার' নামের সার্থকতার সূচনা হতে পারে।

বর্তমানে জেলা পর্যায়ে মামলা জটের একমাত্র না হলেও প্রধান কারণ বিচারকগণের অপ্রতুলতা। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে এজলাসের সঙ্কট। কিছু কিছু নূতন ভবন নির্মাণ শুরু হলেও শোনা যাচ্ছে যে, অধিক সংখ্যক বিচারকের পদ সৃষ্টিতে ঐতিহ্যগতভাবে

জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়দ্বয়কে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না যে, এই সামান্য সংখ্যক বিচারক দ্বারা কিছুতেই বর্তমানের ৩০ লক্ষ মামলার জট কোনভাবেই সমাধান সম্ভব নয়। বরঞ্চ প্রতিদিনই নূতন নূতন মামলা মোকদ্দমা দায়ের হচ্ছে ও সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপর্যুক্ত মন্ত্রণালয়দ্বয়কে উপলব্ধি করতে হবে যে দক্ষ বিচার বিভাগ ব্যতিরেকে উন্নয়ন কর্মসূচি সফল হওয়া দুরূহ হবে। তাছাড়া, বিদেশী বিনিয়োগকারীগণকে এদেশে বিনিয়োগ করে যদি বছরের পর বছর মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হতে হয়, সেক্ষেত্রে তারা বিনিয়োগ করতে নিরুৎসাহিত হবে।

বর্তমানে এজলাসের যে অভাব রয়েছে, তা জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ে অবস্থিত পূর্বতন এজলাসগুলি নূতন ভবন নির্মান না হওয়া পর্যন্ত আপাতত ব্যবহার করা যেতে পারে। দক্ষ ও যোগ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণকে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। তাতে স্বল্প সময়ে বিচারাধীন আপীল ও অন্যান্য মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হতে পারে।

বিচার বিভাগের উন্নয়নের জন্য আমাদের লক্ষ্য হবে যে, ন্যায়বিচার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে কারণ এটা বিচার প্রার্থীগণের সাংবিধানিক অধিকার। এই অধিকার সমুন্নত রাখতেই হবে। এ ব্যাপারে কোন প্রকার আপোষ করা যাবে না। কোন প্রকার short-cut সমাধান চিন্তা করা যাবে না। এই লক্ষ্য স্থির রেখে মামলার জট্ নিরসন এবং বিচার বিভাগের সার্বিক উন্নয়ন এর কথা চিন্তা করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে ওকালতি পেশা সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত না করলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারণ এ্যাডভোকেট মহোদয়গণ সমগ্র বিচার ব্যবস্থায় একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেন। তাদের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে বিচার ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তারা ফৌজদারী মামলায় ফরিয়াদী ও আসামীদের পক্ষে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দেওয়ানী মোকদ্দমায় তারা বাদী-বিবাদী পক্ষে আদালতে উপস্থিত হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে থাকেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে বার ও বেঞ্চ একে অপরের পরিপূরক। এর সঙ্গে এও বলা প্রয়োজন যে a strong Bar makes a strong Bench।

এ প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, বিচার বিভাগের সমস্যা ও এর সমাধানের সঙ্গে বিচারকদের সাথে এ্যাডভোকেটগণেরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যে সকল পদক্ষেপ এ্যাডভোকেটগণের নিকট হতে আশা করা যায় তা নিম্নরূপঃ

দেওয়ানি মোকদ্দমার ক্ষেত্রেঃ

১। মোকদ্দমা দায়েরের সময় আরজী সঠিকভাবে প্রস্তুত করা এবং সকল বিবাদীগণের নাম ঠিকানা সঠিকভাবে লেখা। তাছাড়া চূড়ান্ত নোটিশ, সমন, খামে নাম ঠিকানা ইত্যাদি সঠিকভাবে লেখা।

২। মামলার মুলতবীর দরখাস্তসহ অন্যান্য অহেতুক আবেদনপত্র দাখিল নিরুৎসাহিত করা।

৩। সকল আইনী পদক্ষেপ যথাসময়ে নেওয়া।

৪। মোকদ্দমা, রিভিশন, আপীল ইত্যাদি দায়েরের ব্যাপারে যথাযথ আইনী পরামর্শ প্রদান করা।

ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রেঃ

১। আসামীকে সঠিক আইনী পরামর্শ প্রদান করা।

২। সঠিক ও সুনির্দিষ্টভাবে আইনের আওতায় থেকে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনে আইনী সহয়তা প্রদান করা।

সমগ্র আইনী কার্যবিধির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সঠিক সময়ে, সঠিক আইনগত পরামর্শ। বিরোধ শুরু হলে উভয় পক্ষই emotionally charged থাকে, জেদ কাজ করে, উস্কে দেয়ার লোকেরও অভাব থাকে না। সেখানেই প্রয়োজন সঠিক আইনগত পরামর্শ। ধারণা করা যায় যে, সঠিক সময়ে সঠিক আইনগত পরামর্শ প্রদান করা হলে ৫০-৬০% মোকদ্দমা দায়েরই হত না।

তিন-চার যুগ আগে দেখা গেছে যে আইনজীবীগণ frivolous অহেতুক ও তুচ্ছ মামলা/মোকদ্দমা করতে নিরুৎসাহ করতেন, দুঃজনক হলেও সত্য যে এখন আর সে রকমটি নেই।

আর একটি ব্যাপার খেয়াল করা যায়। একশ-দেড়শ বৎসর পূর্বেও আইনজীবীগণ যে কোন মোকদ্দমা গ্রহণ করার পূর্বে এর merit সম্বন্ধে একটা আইনগত মতামত প্রদান করতেন, মক্কেল তার জন্য ফিসও প্রদান করতেন। এখন সেই ট্রাডিশন আর নেই। আজকাল মক্কেল তার আইনজীবীকে একটি modest fee দিতেও নানা গড়িমসি করে, কিন্তু যদি বলা হয় যে পেশকার/বেঞ্চ অফিসার এমনকি বিচারককেও টাকা দিতে হবে তাতে কিন্তু মক্কেল কোন অনীহা প্রকাশ করে না।

এই ভাবেই সর্বস্তরে human values নিম্নগামী হচ্ছে।

আরও একটি বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন যে যেখানে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সর্বস্তরে দুর্নীতি, মূল্যবোধের অবক্ষয় সেখানে বিচার বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণ সাধু-সন্ত থাকবেন তা আশা করা বাতুলতা মাত্র। মনে রাখতে হবে তারা সমাজ বিছিন্ন নন, বরং এই সমাজেরই একটি অংশ। এক্ষেত্রে সামগ্রিক সামাজিক সংস্কার প্রয়োজন।

অধ্বস্তন আদালতসমূহে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিতে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা ও উক্ত সমস্যাবলী হতে উত্তরণের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় আদালতের জন্য প্রযোজ্যঃ

১। **অপ্রতুল সংখ্যক বিচারকঃ** বর্তমানে ৯,৮৫,৫০৯ টি ফৌজদারী মামলার বিপরীতে মাত্র ৪২০ জনের মত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছেন। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি ব্যতিরেকে সহকারী জজ হতে আরম্ভ করে জেলা ও দায়রা জজ এবং জেলা পর্যায়ের অন্যান্য আদালতে আরো প্রায় ১৬,৪৫,৯৬৬ টি দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এই বিপুল পরিমান মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে মাত্র ১১০০ জন্য বিচারক রয়েছেন। দেশের নিম্ন আদালতের বিচারাধীন প্রায় ২৬ লক্ষ মামলাসহ নূতন দায়েরকৃত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণে কমপক্ষে আরও ৩০০০ নূতন বিচারক নিয়োগ করা অতি অবশ্যক।

২। **এজলাসের অভাবঃ** অনেক জেলাতেই একটি এজলাসে দুই বা ততোধিক বিচারকগণ বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকেন। তাই দেশের আদালতসমূহে পর্যাপ্ত সংখ্যক এজলাস স্থাপন করা আবশ্যক।

৩। **প্রশিক্ষণঃ** যদিও প্রাথমিক অবস্থায় বিচারকগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, সার্ভে সেটেলমেন্ট ট্রেনিং, BPATC সহ যাবতীয় সকল ট্রেনিং এবং extensive in-service training সহ অন্ততঃ দেড় বছর প্রশিক্ষণ দেয়ার পূর্বে আদালতে সরাসরি বিচারিক কার্যক্রমে নিয়োজিত করা ঠিক নয়, কিন্তু বর্তমানে অতি অল্প মেয়াদে সামান্য প্রশিক্ষণ দিয়েই জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা সহকারী জজ আদালতে বিচারকগণ বিচার কার্যে নিয়োজিত হচ্ছেন। এর ফলে তাদের অনভিজ্ঞতার কারণে মামলা নিষ্পত্তিতে যেমন দীর্ঘসূত্রতা হচ্ছে তেমনি ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাবার সম্ভাবনা বাড়ছে। ফলশ্রুতিতে আপীল ও রিভিশনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪। আদালতসমূহে বিরাজমান স্টেনো-টাইপিষ্ট এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহায়ক কর্মচারীর অপ্রতুলতার স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৫। আদালতসমূহে বিরজমান টাইপ মেশিনের পরিবর্তে কম্পিউটার টাইপ চালু করতে হবে এবং কম্পিউটারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতির অভাব দূর করতে হবে।

৬। বিচারিক আদালতে সাক্ষীর সাক্ষ্য বিচারককে নিজ হাতে ঘন্টার পর ঘন্টা লিপিবদ্ধ করতে হয়। দিনের পর দিন এরূপ সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে বিচারকের দক্ষতা কমতে বাধ্য। উপরন্তু, এক প্রকার অনীহারও সৃষ্টি হয়। এর সমাধান প্রয়োজন। স্টেনো টাইপিষ্টের মাধ্যমে কম্পিউটারে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য বিচারকসহ উভয়পক্ষের আইনজীবীদের সম্মুখে একটি করে মোট তিনটি মনিটর রাখা একটি সমাধান হতে পারে।

৭। **সাক্ষীর অনুপস্থিতিঃ** সাক্ষ্য গ্রহণে বিলম্ব মামলার দীর্ঘসূত্রতার একটি অন্যতম প্রধান কারণ। ফৌজদারী মামলায় পুলিশকে দ্রুত সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। স্পর্শকাতর মামলা প্রমাণে সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য 'সাক্ষী সুরক্ষা আইন' প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৮। **ক্রমাগত শুনানীঃ** সি.আর.ও. এর ১২৫-১২৬ বিধিতে এবং সিআর.আর.ও. এর ৩৩-৩৪ বিধিতে সুস্পষ্ট বিধান থাকা স্বত্ত্বেও একটি মোকদ্দমায় ক্রমাগত সাক্ষ্য গ্রহণ না করে দিনের পর দিন শুনানী মূলতবী করতঃ শুনানী প্রলম্বিতকরণ রোধকল্পে সি.আর.ও. এবং সিআর.আর.ও. এর বিধির বিধান অনুসারে মামলা ক্রমাগত শুনানী অন্তে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন ।

৯। প্রতিটি জাজ্‌শীপে সি.আর.ও. এবং সিআর.আর.ও. এর বিধান মোতাবেক নিয়মিত জুডিসিয়াল কনফারেন্স আয়োজন নিশ্চিত করা এবং বিদ্যমান সমস্যার আলোচনা ও সমাধান করা।

১০। একাধিক মামলা আংশিক শ্রুত অবস্থায় রাখার চেয়ে যতগুলো সম্ভব মামলায় রায় প্রদান করাই অধিক শ্রেয়।

১১।যে সকল মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত অন্তে যুক্তি-তর্ক শ্রবণ ও রায় প্রদানের জন্য অপেক্ষমান, সে সকল মামলায় রায় না দেওয়া পর্যন্ত কোন বিচারককে বদলি না করার নীতি থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া, বাৎসরিক ছুটি গ্রহণ করার পূর্বে তারা তাদের pending রায় ও আদেশ প্রদান করবেন।

১২। বিচারকগণ কর্তৃক রায় প্রদানে অহেতুক বিলম্ব পরিহার করে যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে রায় প্রদান করতে হবে।

১৩। নিম্ন আদালতে চলমান কোন মামলা উচ্চ আদালত কর্তৃক অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার প্রবণতার সমাধান প্রয়োজন।

১৪। অস্বাভাবিক অবস্থা ব্যতিরেকে মামলার শুনানী মূলতবী না করা, মূলতবী করলেও স্বল্প সময়ের জন্য মূলতবী করা।

১৫। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলাসমূহের ক্ষেত্রে সরকারী কৌশুলীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা। সেই সাথে তাদেরকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন ও যথেষ্ট পরিমাণ ফি প্রদান করা প্রয়োজন। এতে সৎ ও যোগ্য এ্যাডভোকেটগণ আকৃষ্ট হতে পারেন।

১৬। গুরুত্বপূর্ণ আদালতসমূহে বিচারক নিয়োগ প্রদানে প্রশাসনিক শৈথিল্য দূর করা। বিচারকদের নূতন পদ সৃজনে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অবিরাম ও দীর্ঘস্থায়ী নিচেষ্টতা সর্বজন বিদিত। উক্ত মন্ত্রণালয়গুলিকে বুঝতে হবে যে বিচার বিভাগ দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হলে বিদেশী বিনিয়োগ শ্লথ হবে।

১৭। জেলার সকল বিচারকদের উপস্থিতিতে প্রতিটি জাজ্‌শীপের জেলাজজ কর্তৃক মাসিক মত বিনিময় সভা আয়োজনপূর্বক দ্রুত মামলা নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় নিদের্শনা ও কর্মকৌশল নিরূপন করা এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক আদেশ প্রদান করা।

১৮। জেলা ও দায়রা জজ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, অন্যান্য বিচারকগণ, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সমন্বয়ে প্রতি জেলায় একটি কমিটি গঠনপূর্বক প্রতি তিন মাস অন্তর বিচারিক কার্যক্রম পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।

১৯। অধস্তন আদালতসমূহের মামলার দীর্ঘসূত্রতা হ্রাসকল্পে প্রতি জেলায় জেলা ও দায়রা জজের নেতৃত্বে জেলা জাজ্‌শীপে অবস্থিত সকল আদালত ও বিভাগের মধ্যে সমন্বিত কর্মকৌশল গ্রহণ করা।

২০। আদালতসমূহে পর্যাপ্ত বই পুস্তক সরবরাহপূর্বক প্রতিটি আদালতে লাইব্রেরীর আধুনিকীকরণ করা।

২১। জেলা জাজ্‌শীপসমূহের বিভিন্ন আদালতের বিচারাধীন মামলাসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সমমানের একটি আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা অনেক বেশী, পক্ষান্তরে অপর একটি আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। এক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ২৪ ধারা মতে জেলা জজ স্বপ্রণোদিত হয়ে তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে মামলার ভারে ভারাক্রান্ত আদালত থেকে কিছু মামলা উত্তোলন করে বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য স্বল্প মামলার আদালতে স্থানান্তর করতে পারেন। তাছাড়া, জাজ্‌শীপে নতুন বিচারক যোগদান করলে বা নতুন আদালত চালু হলে জেলা জজ সমমানের কোর্ট থেকে সহজ প্রকৃতির মামলাগুলো উত্তোলন করে নবীন বিচারকদের আদালতে বিচারের জন্য স্থানান্তর করতে পারেন (সি.আর.ও. এর ৯১৫ বিধি)। জেলা জজ

উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে মামলা স্থানান্তর করলে জাজ্‌শীপের মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। জেলা জজদের এ ধরণের ক্ষমতা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

২২। মামলার জট জরুরী ভিত্তিতে কমানোর লক্ষ্যে সৎ ও কর্মঠ অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদেরকে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ ও পদায়ন করলে পুরাতন বিচারাধীন দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার শুনানি, আপিল ও রিভিশন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, এরূপ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ফলে নিয়মিত বিচারকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি হবে না।

২৩। আইন মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা জেলা পর্যায়ের সকল আদালতের উপর জেলা জজের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করলে জেলা জাজ্‌শীপ এর আদালত সমূহে নিষ্পত্তি বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

২৪। বিচারকগণের deputation এর নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরন করা প্রয়োজন।

২৫। বিচারকগণের ACR এমনভাবে লেখা প্রয়োজন যাতে তাদের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়।

২৬। বিচারকগণের পদোন্নতি কেবল তাদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়, বরঞ্চ তাদের রায় ও ACR এর ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন।

২৭। রাষ্ট্রের অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসের ন্যায় বিচার বিভাগের কর্মকর্তাগণের পদোন্নাতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদনের অব্যবহিত পরেই গেজেট হবে এবং পদোন্নতি কার্যকরী হবে যদিও পদায়ন পরে পারে।

২৮। জাতীয় পর্যায়ে Case Management Authority প্রতিষ্ঠা করে দেশের সকল আদালতে বিচারাধীন মামলার পরিক্রমা পর্যবেক্ষণ করা এখন সময়ের প্রয়োজন।

দেওয়ানি আদালতের জন্য প্রযোজ্যঃ

দেওয়ানি মামলার বিভিন্ন পর্যায়ে মামলার দীর্ঘসূত্রতার জন্য ক্রিয়াশীল কারণসমূহ পর্যালোচনায় দীর্ঘসূত্রতা হ্রাসে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী নিশ্চিত করতে হবেঃ

১। মামলা দায়েরের পরপরই এর গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণ করতঃ অনেক ভিত্তিহীন মোকদ্দমাই প্রাথমিক পর্যায়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব।

২। সি.আর.ও. এর বিধান অনুসারে প্রত্যেক বিচারক কর্তৃক বিচারিক কাজের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৩। যথা সময়ে সমন জারী নিশ্চিতকরণসহ প্রতিটি জাজ্‌শীপের নেজারত বিভাগের কার্যক্রমের সার্বক্ষণিক তদারকি নিশ্চিত করা; কারণ সমন গরজারী মোকদ্দমার দীর্ঘসূত্রতার একটি প্রাথমিক ও প্রধান কারণ। সেই সাথে জারীকারকগণকে শুধু বেতন নয়, প্রতিটি জারীর জন্য পর্যাপ্ত রাহা খরচ ও incentive হিসাবে ভাতা প্রদান করা জরুরী।

৪। বাদীপক্ষের আরজি সংশোধনের পৌনঃপুনিকতা ও বিবাদীপক্ষের লিখিত জবাব দাখিলে অস্বাভাবিক বিলম্ব রোধকরণে আদলতসমূহ কর্তৃক আইনের বিধান দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা।

৫। অন্তর্বর্তীকালীন দরখাস্তসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা।

৬। প্রয়োজনীয় তদবীর গ্রহণে মামলার পক্ষসমূহের সময়ক্ষেপণের প্রবণতা হ্রাস করা।

৭। সংশ্লিষ্ট নাবালকের মামলাতে দ্রুততম সময়ে কোর্ট গার্ডিয়ান নিয়োগ করা।

৮। নিম্ন আদালতে চলমান মামলা সম্পর্কিত যে কোন রিভিশন উচ্চ আদালত কর্তৃক যথাসম্ভব দ্রুত নিষ্পত্তি করা।

৯। অহেতুক পুনঃবিচারের জন্য নিম্ন আদালতে প্রেরণ না করে যথাসম্ভব আপীল আদালত কর্তৃক মামলা নিষ্পত্তি করা।

১০। আদালত কর্তৃক তলবকৃত নথি/ভলিউম যথাসম্ভব দ্রুত সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণ নিশ্চিত করা।

ফৌজদারি আদালতের জন্য প্রযোজ্যঃ

ফৌজদারি মামলার ৩ (তিনটি) আলাদা পর্যায় রয়েছে। যথা ঃ

(১) প্রাক-তদন্তকালীন পর্যায়

(২) তদন্তকালীন পর্যায়

(৩) বিচারকালীন পর্যায়

প্রাক-তদন্তকালীন পর্যায়

১। থানায় অভিযোগকারীর এজাহার তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করতঃ দ্রুত তদন্ত আরম্ভ করতে হবে। যদি ঘটনাস্থল অন্য থানার এলাকার মধ্যে হয় তাহলেও এজাহার লিপিবদ্ধ করে তড়িৎ সংশ্লিষ্ট থানায় নিজ দায়িত্বে প্রেরণ করতে হবে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে এজাহার গ্রহণ না করলে তার কারণ লিপিবদ্ধ করবেন।

২। ধর্ষনের অভিযোগ থাকলে ধর্ষিতাকে তাৎক্ষণিক সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করতে হবে, কোনরুপ বিলম্ব ঘটলে তার ব্যাখ্যা দিতে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাধ্য থাকবেন।

৩। অভিযোগকারী ও ভিকটিম তাদের সমস্যা নিয়ে থানায় আসেন। রাষ্ট্রের কর্তব্য তাদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল আচরণ করা। যতদুর সম্ভব তাদেরকে সহায়তা প্রদান করা সংশ্লিষ্ট সকলের আইনগত ও নৈতিক দায়িত্ব।

৪। এজাহার ও তৎপরবর্তী সময়ে প্রাপ্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যার প্রকাশ তদন্তকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে, তা পুলিশ কর্তৃপক্ষ তদন্তকালীন সময়ে প্রকাশ করবেন না। সংবাদ মাধ্যম এ ধরণের কোন তথ্য পেলে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে জানাতে পারেন কিন্ত তদন্ত ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে গণমাধ্যমে তা তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ না করাই বিধেয়।

৫। প্রতিটি থানা ভবন ও চত্বর সার্বক্ষণিকভাবে সিসিটিভি এর আওতাভুক্ত করা।

তদন্তকালীন পর্যায়

১। ফৌজদারি মামলার দীর্ঘসূত্রতা হ্রাসের জন্য মামলাসমূহের তদন্তে পৃথক ও স্থায়ী তদন্তকারী সংস্থা গঠনসহ তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৭ ধারার বিধান মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত কাজ সম্পূর্ণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।

২। এজাহারকারী কর্তৃক নারাজী দরখাস্ত শুনানীতে সময়ক্ষেপণের প্রবণতা হ্রাস করা।

৩। এছাড়া তদন্তকালীন পর্যায়ে মামলার দীর্ঘসূত্রতার জন্য ক্রিয়াশীল কারণসমূহ পর্যালোচনায় দীর্ঘসূত্রতা হ্রাসে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী নিশ্চিত করতে হবেঃ

ক) স্বল্পতম সময়ে সংশ্লিষ্ট আলামতসমূহ জব্দ করা ।

খ) জব্দকৃত আলামত সংরক্ষণে সর্বোত্তম উপায় অবলম্বন করা এবং দ্রুততম সময়ে আদালতে উপস্থাপন

করা ।

গ) মামলার সাথে সম্পর্কহীন জব্দতালিকার সাক্ষী উপস্থাপনের প্রচলিত মানসিকতা পরিহার করা ।

ঘ) ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারা মোতাবেক দ্রুত বক্তব্য লিপিবদ্ধকরণ এবং তাতে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখা এবং স্বল্পতম সময়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল নিশ্চিতকরণ।

ঙ) দ্রুততার সাথে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল সার্টিফিকেট ও ময়না তদন্তের প্রতিবেদন সংগ্রহ করা ।

চ) তদন্ত প্রতিবেদনে সকল প্রকার অস্পষ্টতা পরিহার করা ।

ছ) তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখকৃত অপরাধের সাথে প্রতিবেদনে অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখকৃত প্রত্যেক আসামীর সংশ্লিষ্টতা আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করা এবং সম্ভব হলে কোন্ কোন্ সাক্ষীর বয়ান প্রাসঙ্গিক তা চিহ্নিত করা ।

জ) তদন্তকারী কর্মকর্তা তার তদন্ত কার্যে যাতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা পান তা নিশ্চিত করা।

ঝ) তদন্ত কার্যকে প্রভাবিত করবার প্রচেষ্টা হলে প্রচেষ্টাকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ দ্রুত আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ।

ঞ) তদন্তকারী কর্মকর্তাগণকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান।

ট) যথেষ্ঠ সংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তা ও কনষ্টেবল নিয়োগ। তাদের বাসস্থানসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি বৃদ্ধি।

ঠ) থানা পর্যায়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দুইজন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান। তন্মধ্যে একজন প্রশাসন, অন্যজন তদন্ত পরিচালানার দায়িত্বে থাকবেন।

ড) প্রত্যেকটি conviction এর জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পুরষ্কৃত করা। তেমনি খালাস হলে তাকে দায়ী করা, কারণ এর ফলে ভিকটিম, সেই সঙ্গে রাষ্ট্রও ন্যায় বিচার পেতে ব্যর্থ হল।

৫। উর্দ্ধতন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন থেকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা ও অতঃপর রায় হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপের নিবিড় পর্যবেক্ষণ সুনিশ্চিত করা ।

বিচারকালীন পর্যায়

১। আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করতে আসা সাক্ষীদের সুরক্ষা প্রদানসহ অপরাপর সাধারণ নাগরিক সুযোগ সুবিধা যথা-শৌচাগার, বসার জায়গা ইত্যাদি নিশ্চিত করা। অনেক সময়ই সাক্ষীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়। এই আচরণ পরিহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে সাক্ষীর সাক্ষ্যই সমগ্র বিচার ব্যবস্থার প্রধান হাতিয়ার।

২। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় একশত বছর পূর্বে নির্ধারিত সাক্ষীদের ৪ (চার) টাকা রাহা খরচের পরিবর্তে যুগোপযোগী রাহা খরচ বিবেচনায় যাতায়াত খরচ নির্ধারণ করা এবং তাৎক্ষনিকভাবে তা প্রদান করা।

৩। ফৌজদারি মামলায় সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে পুলিশ প্রশাসনকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা।

৪। রিভিশন মামলায় ব্যবহারের জন্য গৃহীত নিম্ন আদালতের নথি উচ্চ আদালত কর্তৃক যথাদ্রুত নিষ্পত্তি অন্তে ফেরত প্রদান।

৫। অভিযোগ পাওয়া যায় যে অনেক সময়ই সাক্ষী আদালতে উপস্থিত হলেও তার হাজিরা দেওয়া হয় না, বরঞ্চ আসামী পক্ষ থেকে তাকে ভয় ভীতি দেখান হয়। এই সমস্যার জরুরী সমাধান প্রয়োজন।

৬। আপোষযোগ্য অপরাধের (compoundable offence) সংখ্যা বৃদ্ধি বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে গুরুতর প্রকৃতির অপরাধ কখনই আপোষযোগ্য হবে না বা ভিকটিম যেন ন্যায় বিচার থেকে কোনভাবেই বঞ্চিত না হন তা নিশ্চিত করতে হবে।

সুপ্রীম কোর্টের জন্য প্রযোজ্যঃ

(হাইকোর্ট বিভাগ)

সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারী পর্যন্ত প্রায় ৩,৬১,০৩৮ টি মামলা বিচারাধীন আছে বলে জানা যায় এবং উক্ত মামলাগুলোর নিস্পত্তির জন্য বর্তমানে ৯৭ জন বিচারপতি কর্মরত আছেন। বিগত ২০০১ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ের পরিসংখ্যান অবলোকন করলে দেখা যাবে যে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মামলার সংখ্যাও সমানতালে বৃদ্ধি পেয়েছে যা অস্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হয়। ছক আকারে বিষয়টি নিম্নরূপে প্রকাশ করা যেতে পারেঃ

বছর	বিচারপতির সংখ্যা	মামলার সংখ্যা
১ জানুয়ারী ২০০১	৫৬	১,২০,২৮০ টি
১ জানুয়ারী ২০০২	৫৫	১,৩৫,৮৭৯ টি
১ জানুয়ারী ২০০৩	৫৭	১,৫৪,১৬৮ টি
১ জানুয়ারী ২০০৪	৭২	১,৬৮,৪৪৭ টি
১ জানুয়ারী ২০০৫	৭২	১,৮৪,৮১১ টি
১ জানুয়ারী ২০০৬	৬৯	২,০৮,৩৮৯ টি
১ জানুয়ারী ২০০৭	৬৫	২,৪০,৪৭৯ টি
১ জানুয়ারী ২০০৮	৬৭	২,৬২,৩৪৫ টি
১ জানুয়ারী ২০০৯	৭৮	২,৯৩,৯০১ টি
১ জানুয়ারী ২০১০	৯৪	৩,২৫,৫৭১ টি
১ জানুয়ারী ২০১১	৯৫	৩,১৩,৭৩৫ টি
১ জানুয়ারী ২০১২	১০১	২,৭৯,৪৩৬ টি
১ জানুয়ারী ২০১৩	৯৫	২,৯৭,৭৩১ টি
১ জানুয়ারী ২০১৪	৯০	৩,২৩,৪৪৬ টি
১ জানুয়ারী ২০১৫	৯৭	৩,৬১,০৩৮ টি

উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলার জট (Backlog) কমানোর লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

১। প্রত্যেকটি মোশান এফিডেভিট এর তারিখ ও ক্রমানুসারে নিস্পত্তি করা প্রয়াজন। এতে বেঞ্চ অফিসারদের দৌরাত্ম্যের হাত থেকে আবেদনকারীগণ রেহাই পেতে পারেন।

২। ২৫-৩০ বছর পূর্বে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে মোশান শুনানী করা হত। যদি মোশান সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় আসে ও রুল absolute হওয়ার আদৌ সম্ভাবনা থাকে শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রেই রুল ইস্যু হত, অন্যথায় সংক্ষিপ্ত আদেশ দিয়ে খারিজ করা হত। এমন কি not pressed করার প্রচলনও ছিল না। বর্তমানেও যথেষ্ঠ সময় নিয়ে মোশান শুনানী করা প্রয়োজন। Frivolous মোশান সরাসরি খারিজ করা অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় মামলার সংখ্যা বাড়তেই থাকবে । অধিক সংখ্যায় বিচারপতি নিয়োগ দিয়েও সমস্যার সমাধান হবে না।

৩। যদি প্রকৃত আইনগত কোন কারণ ছাড়াই রুল ইস্যু করা হয়েছে বলে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট প্রতীয়মান হয় তা হলে তিনি সংশ্লিষ্ট মাননীয় বিচারপতির সাথে আলোচনা করতে পারেন।

৪। রুল ইস্যু করা ব্যতিরেকে আবেদনকারীর পক্ষে কোন আদেশ প্রদান না করা।

৫। হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক রুল জারী করার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে তা নিষ্পত্তি না হলে উক্ত রুল স্বয়ংক্রিয়ভাবে খারিজ হবার বিধান প্রণয়ন করার বিষয়টি বিবেচনা করা। বিষয়টি মাননীয় প্রধান বিচারপতি তাঁর Practice Direction এর ক্ষমতাবলে নিশ্চিত করতে পারেন।

৬। মামলা নিষ্পত্তির উপর জোর তাগিদ দিতে হবে। যে বেঞ্চ রুল ইস্যু করেন উক্ত বেঞ্চকেই ইস্যুকৃত রুলগুলোর শুনানী অন্তে নিষ্পত্তির নির্দেশ প্রদান করা যেতে পারে। সে পর্যন্ত ঐ বেঞ্চের মোশন ক্ষমতা স্থগিত থাকবে।

৭। হাইকোর্ট বিভাগের সকল বেঞ্চের নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা মনিটর করা প্রয়োজন। প্রত্যেক বেঞ্চের আগামী ছয় মাসে নিস্পত্তিতব্য মামলার ক্রমিক নম্বর অনুসারে ৬ (ছয়) মাসের তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে। উক্ত তালিকা ওয়েবসাইটেও দেওয়া যেতে পারে। উক্ত তালিকা অনুসারে কোন রূপ মুলতবি ব্যতিরেকে মামলা নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

৮। অবকাশকালীন বেঞ্চের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

৯। হাইকোর্ট বিভাগের বেঞ্চ অফিসারদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। তাঁদেরকে ক্রমাগত বদলিসহ কঠিন হাতে মনিটরিং এর মধ্যে রাখতে হবে। প্রয়োজনে দুদককে অভিযোগ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে তদন্ত করতে দিতে হবে। কেউ আইনের উর্ধ্বে নয় তা সকলকে উপলব্ধি করতে হবে।

১০। সমগ্র বিশ্বে সকল আদালতে খরচা (Cost) আরোপ এর বিধান রয়েছে। বাংলাদেশেও সকল দেওয়ানি আদালতে বিশেষ করে সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে কোন তুচ্ছ (Frivolous) বিষয়ে মামলা দায়ের হলে খরচা আরোপ করা বিশেষ প্রয়োজন। অন্যথায়, কখনই Meritless বিষয়ে মোশন বা লিভ আবেদনপত্র বন্ধ হবে না।

১১। সুপ্রীম কোর্টের আদেশের অনুলিপি ও রেকর্ড নিম্ন আদালতে দ্রুত প্রেরণ নিশ্চিত করা।

১২। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মামলার নিষ্পত্তি পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি ‘‘মনিটরিং সেল” তৈরী করা।

***